গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৬ - ২২ ডিসেম্বর, ২০১১ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

শোকস্তব্ধ বাংলা

১০ ডিসেম্বর আমরি হাসপাতালের সামনে ঃ শোকবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন রাজ্য কমিটির সদস্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। নীরবতায় সামিল সর্বস্তরের মানুষ।

এসেছিলেন বাঁচতে, স্বাস্থ্যব্যবসায়ীরা কেড়ে নিল ওঁদের প্রাণ

৯ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ভোরবেলা যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন চারদিকে কালো ধোঁয়ার সাথে শুধুই হাহাকার, কান্না, আর মৃত্যুর বিভীষিকা। হাসপাতালে আটকে পড়া রোগীদের আত্মীয়েরা পাগলের মতো ছুটছেন এদিক-ওদিক। এক-একটা মৃতদেহ বের করে নিয়ে আসছেন সংলগ্ন পঞ্চাননতলার যুবকরা আর আত্মীয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন, দেখছেন তাঁদেরই প্রিয়জন কি না। যাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁরা জড়িয়ে ধরে দেখছেন দেহে প্রাণ আছে কি না। বেশিরভাগেরই দেহে প্রাণ ছিল না। বিষাক্ত গ্যাসে কালো হয়ে গিয়েছিল নিথর দেহ।

আমাদের কয়েকজন দ্রুত বিল্ডিংয়ে উঠে গিয়ে উদ্ধারের কাজে হাত লাগালেন স্থানীয় যুবকদের সাথে। এই যুবকরা আগুন টের পেয়েছিলেন একেবারে শুরুতেই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা ছুটে এসেছিলেন আর্ত মানুষগুলিকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ঢোকার উপায় ছিল না, হাসপাতালের গেট ছিল বন্ধ। বারবার বলা সত্ত্বেও ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজি হয়নি কর্তৃপক্ষ। বলেছেন, কারোর প্রয়োজন নেই, আমরাই সামলে নেব। রোগীদের বাঁচার অন্তিম চেষ্টা, আর আর্ত চিৎকার শুনে স্থির থাকতে পারেননি যুবকরা। তাঁদের কেউ কেউ

চারের পাতায় দেখুন

মনুষ্যত্ব বিবেক রয়েছে ওঁদেরই মধ্যে

‘ওরা বস্তিবাসী। ওদের মানুষ বলে গণ্য করিনি কোনওদিন, ঘেন্নার চোখে দেখেছি। বলেছি ওদের জন্যেই কলকাতার এই হাল, কবে যে দূর হবে ওরা! অথচ আজ দেখুন, ওরা ছিল বলেই ....’। আর বলতে পারলেন না ভদ্রমহিলা, কান্নায় গলা বুজে এল তাঁর। অগ্নিদগ্ধ আমরি হাসপাতালের সামনে রোগীদের উদ্বেগাকুল পরিজনের উদভ্রান্ত জটলার মাঝে তিনিও ছিলেন।

ওঁদেরই কয়েকজন

ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে ঝকঝকে কর্পোরেট পরিবেশের আমরি হাসপাতাল। সেখানে ঢোকার অনুমতি ছিল না লাগোয়া পঞ্চাননতলা বস্তির মানুষগুলোর। অথচ ৯ ডিসেম্বরের সেই ভয়ানক রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যখন মৃত্যুপুরীতে রোগীদের ফেলে পালিয়েছে, তখন জীবনের তোয়াক্কা না করে বস্তির এই মানুষগুলোই আপ্রাণ লড়াই করে গেলেন আগুনে আটকে পড়া রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই, তবু পরোয়া করেননি। শুধু ছেলেরাই নয়, এই জীবন বাঁচানোর লড়াইয়ে সমান অংশ নিয়েছেন বস্তির মেয়েরাও।

অন্যান্য দিনের মতোই অবিশ্রান্ত খাটুনির শেষে সেদিনও হা-ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুমিয়েছিলেন বস্তির ঘরে। রাত ২টো নাগাদ হঠাৎ মানুষের আর্ত চিৎকার আর ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন আমরি হাসপাতাল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আটকে পড়া মানুষের বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টার ছবি ফুটে উঠেছে কাচের জানলায়। আগুন লেগেছে বোঝা মাত্রই আমরির গেটে ছুটে গেছেন শঙ্কর মাইতি, উত্তম গুপ্ত, পাপিয়া সিং, জুলিয়া সিং, দীপপ্রকাশ, সমর মণ্ডল, ছোটু ময়রা, শিবু ঘোষ, বাসুদেব, বাঁটুল নস্করদের মতো বস্তির ছেলেমেয়েরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের

পাঁচের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে শোকপালন

আমরির মর্মান্তিক ঘটনায় শত মানুষের মৃত্যুতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করে এবং ঘটনার পরদিন ১০ ডিসেম্বর রাজ্যবাসীকে শোকদিবস পালন ও সকাল ১০টায় ২ মিনিট নীরবতা পালনের আবেদন জানায়। আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের সর্বত্র দলের কর্মী-সমর্থক-দরদীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ শোকপালনে সামিল হন। আমরি হাসপাতালের সামনে দলের পক্ষ থেকে মৃতদের স্মরণে শোকবেদি স্থাপন করা হয়। সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, পঞ্চাননতলার নাগরিকদের পক্ষে দীপক দাস, সে দিনের উদ্ধারকারী স্থানীয় যুবকদের পক্ষে দীপপ্রকাশ কয়াল, অনিল

পাঁচের পাতায় দেখুন

শোকপ্রকাশ রাজ্য কমিটির

আমরি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রোগীদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের দ্বারা পরিচালিত কর্পোরেট হাসপাতালগুলিতে গরিব-মধ্যবিত্ত রোগীদের রক্ত নিংড়ে চিকিৎসার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। অথচ হাসপাতাল মালিকরা প্রাণ বাঁচানোর সুরক্ষা ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং বিপদকালীন নিরাপত্তা ও দ্রুত নিষ্ক্রমণ ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই রাখে না এবং সর্বোপরি দমকল, স্বাস্থ্য সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সার্টিফিকেট তারা অসদুপায়ে সংগ্রহ করে, যার ফলে হাসপাতালগুলি জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। এরই মর্মান্তিক পরিণতিতে আমরি হাসপাতালে আজ ভোররাতের বেদনাদায়ক ঘটনার বলি হল নার্স ও শিশু-বৃদ্ধ সহ প্রায় শত রোগী।

সিপিএম-এর ৩৪ বছরের শাসনে সরকার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অপদার্থ পরিচালন ব্যবস্থায় এগুলি আরও প্রশ্রয় পেয়েছে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে মৃতদের এবং গুরুতর আহতদের আত্মীয়-পরিজনদের শোক ও সমবেদনা জানানোর কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আমরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

চারের পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স কি গণতন্ত্র ফেরাতে পারবে

রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করেছে। এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সিপিএম ক্ষমতাসীন হয়ে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল। কী হয়েছিল তার ফল? নতুন সরকারের এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্যই বা কী?

রাজ্যের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মানুষ জানেন, ১৯৭৮ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আইনের গণতন্ত্রীকরণ করার নামে অর্ডিন্যান্স জারি করে কলকাতা, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে বাতিল করে ও মনোনীত পরিচালন সমিতি চাপিয়ে দেয়। তখন তার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-ছাত্র-অভিভাবক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অরবিন্দনাথ বসু শিক্ষার উপর এমন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেছিলেন। ৬-১১-৭৯ তারিখে রাজ্যপালকে পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছিলেন, "রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের উপর নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তীব্র আক্রমণ। ...একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ঘটনা শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে না ভাবিয়ে পারে না।" পরিশেষে তিনি লিখেছিলেন, ''I, a humble servant to that cause, should record my protest by tendering my resignation....''। উপাচার্য হিসাবে একমাত্র অরবিন্দবাবুই সেদিন এমন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর ছাত্রদের গর্বিত করেছিল। বাম-মনস্ক মানুষ তিনি ছিলেন না, ছিলেন একজন মুক্তমনের মানুষ, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। সেদিন নব নির্বাচিত সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল শিক্ষায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আজও তেমন পদক্ষেপ গ্রহণের পুনরাবৃত্তি একই প্রতিশ্রুতিতে ঘটছে।

বর্তমান অর্ডিন্যান্স কী করতে পারে সেই আলোচনা জরুরি। দুটি অর্ডিন্যান্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে — প্রথমটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকার ইচ্ছা মতো 'নিজেদের লোক' বসিয়ে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার একটি পদ্ধতি অন্তত ঘোষণা করেছে — পরিচালন সমিতি গঠন কেমন করে হবে। সরাসরি পছন্দের লোকের নাম ঠিক করে না দিলেও সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ সেখানে খোলাই আছে।

শিক্ষায় স্বাধিকারের অর্থ — শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মূলত শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, তাঁরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন 'কী পড়ানো হবে ও কে পড়াবেন'। আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে সরকারের উপর, কিন্তু সেই দায়িত্ব কখনই তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপের অধিকার দেবে না। স্বাধিকারের এই ধারণাই হল শিক্ষায় গণতন্ত্রের ধারণা — যার জন্য এদেশের রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বরা সে যুগে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ যেমন, শিক্ষক, আধিকারিক, শিক্ষাকর্মী, গবেষক, ছাত্র প্রভৃতি অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব রাখা যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। দেশের প্রায় সকল রাজ্য-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থাপনাটা তাই-ই। সিপিএম দাবি করছে, তারাই প্রথম এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছিল এবং নিয়ম করে ৪ বছর অন্তর নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল। তাহলে তাদের অগণতান্ত্রিক বলা হবে কেন? আসলে আইনে কী আছে দেখলেই বোঝা যাবে তাদের পরিকল্পনা কী ছিল। গণতান্ত্রিকতার আড়ালে তাদের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রটিকে দলের কুক্ষিগত করা। বাস্তবে আইন এমন ছিল যে শিক্ষক-আধিকারিক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ দলীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গত ১৫-২০ বছরে এমন কোনও নিয়োগ প্রায় ঘটেনি যা নগ্ন দলবাজির শিকার নয়। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় প্রায় বিরোধীশূন্য হয়ে যায়। শোনা যায়, কলেজ শিক্ষক সংগঠনের এক রাজ্য সম্পাদক তাঁর ক্ষমতা কত, তা জাহির করতে ঘনিষ্ঠ মহলে বলতেন, 'এমন কোনও উপাচার্য নেই যাঁর নিয়োগে তাঁর ভূমিকা নেই।' কী কুৎসিত মন্তব্য! দম্ভ প্রকাশেরও একটা রুচি থাকে!

স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাবিদ মহল আন্তরিকভাবে এর পরিবর্তন চাইছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা গত সরকার 'পরিবর্তনের' আন্দোলনে যে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল তা অনস্বীকার্য। ঐ আন্দোলনের ফসল হিসাবে যে শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসীন হলেন তাদের কাছে স্বভাবতই মানুষের প্রত্যাশা অনেক। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় বিল আনবে, তারও আগে শিক্ষক, শিক্ষাবিদদের মতামত নেবে বিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে — যা বিগত সরকার করেনি।

আজ যাঁরা অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করলেন তাঁরাও কি এই কাজগুলি করলেন? বাস্তব হল, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে এই অর্ডিন্যান্সের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এমনকী শাসক দলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদদেরও না। অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হলে কাউকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। বিগত সরকার নিয়োজিত কতিপয় উপাচার্য ও তাঁদের কুৎসিত আচরণ দেখে বর্তমান আইন প্রণেতারা যে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির রাজনৈতিক মত পোষণের মৌলিক অধিকারের উপরই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। একজন বড় মাপের শিক্ষাবিদের রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকাটা তাঁর উপাচার্য হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে কেন? আবার সরাসরি রাজনৈতিক আনুগত্য না থাকলেই তিনি 'খাঁটি' হয়ে যাবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? বহু উদাহরণ আছে, যেখানে দলীয় সদস্য না হয়েও কোনও কোনও ব্যক্তি অত্যন্ত নগ্নভাবে শাসক দলের প্রায় দাস হিসাবে কাজ করে উপাচার্য পদটিকে কলংকিত করেছেন। যেটা জরুরি তা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা এমন হওয়া উচিত যে, কোনও উপাচার্য ইচ্ছা করলেও কোনও দলের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না। বৃহত্তর সমাজেরও এখানে ভূমিকা পালন করার আছে। এগুলি না হলে উপাচার্যের রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে রাজ্যপালের হাজার গোয়েন্দাগিরিও শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থাকে 'দলতন্ত্র' মুক্ত করতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সংস্থাগুলিতে অবশ্যই ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি থাকা উচিত। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। নতুন অর্ডিন্যান্সে পরিচালন সমিতিগুলি হবে বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিক এবং মনোনীত ও পদাধিকার বলে আসীন সদস্যে ভরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে নির্বাচিত সদস্য হবে মোট সংখ্যার ৫ শতাংশেরও নিচে। মনোনীত ও পদাধিকার ভিত্তিক নয়, নির্বাচন ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব আপেক্ষিক অর্থে যে বেশি গণতান্ত্রিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনোনীত সদস্য যে প্রয়োজনেও সরকারি নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না, সেটাও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থাটাই চলে যাবে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে যেখানে দলীয় ও সরকারি অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ থাকবে, 'দলতন্ত্র' আরও জাঁকিয়ে বসবে। ফলে এই অর্ডিন্যান্স শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র হত্যার ঐতিহ্যই যে বজায় রাখবে এতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

নদিয়ায় আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন

৩ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম দিবসে হাঁসখালী থানার সূর্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ডি এস ও-র স্থানীয় সম্মেলন। সম্মেলনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, কালা অর্ডিন্যান্স জারির বিরুদ্ধে ও ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার হননের কালা সার্কুলারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি তোলেন বক্তারা।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগর লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

'৭০ দশকের শুরুতে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাথে যুক্ত হন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দলের নানা কাজে বিশেষত '৮০-র দশকে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আজীবন শিক্ষানুরাগী কমরেড রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এলাকায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং দলের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। '৭০ দশকের মধ্যভাগে এলাকায় অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি তৎকালীন শাসককুলের বিরাগভাজন হন। তিনি এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, ছাত্র, সহকর্মী, দলের কর্মী-সমর্থকবৃন্দ ছুটে আসেন। শ্যামনগর পার্টি অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল তাঁর মরদেহে দলের রক্তপতাকা এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া দলের শ্যামনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, তৃণমূল কংগ্রেস ও স্থানীয় নানা সংগঠনের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর মরদেহ দলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে উপস্থিত কমরেডরা মাল্যদান করেন ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে চোখের জলে প্রয়াত কমরেডকে শেষ বিদায় জানান।

৪ ডিসেম্বর শ্যামনগর মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে প্রয়াত কমরেডের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড সদানন্দ বাগল। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সলিল গুহ।

কমরেড রমেন্দ্রনাথ ঘোষ লাল সেলাম

আমাদের সকলকেই ভর্তি নিতে হবে — দাবি শিশুদের

'প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণিতে সমস্ত ছাত্রদের ভর্তি নিতে হবে, লটারির নামে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না' — এই দাবিতে ৫ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। 'সব ধরনের ছাত্র সব স্কুলে পড়বে' — এই চটকদার কথার আড়ালে লটারি সিস্টেম চালু করে সরকার সব ছাত্রের ভর্তির দায়িত্ব অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ এ আই ডি এস ও-র। তাদের দাবি সকল ছাত্রকে ভর্তি নিতে হবে এবং মেধার ভিত্তিতে ক্রম নির্ধারণ করতে হবে। ডেপুটেশনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, ফি বৃদ্ধি এবং জীবনশৈলীর নামে যৌনশিক্ষা চালুর বিরোধিতা করা হয়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস দীপক পাত্র, মঙ্গল নায়ক, দীপক রায়, শিউলি মান্না।

৫৪টি পরিবার তলিয়ে গেল নদীগর্ভে, প্রশাসন কোথায়

পদ্মার ভাঙন মুর্শিদাবাদের অভিশাপ। সেই ভাঙনে আবারও তলিয়ে গেল ৫৪টি পরিবার। লালগোলা ব্লকের ময়াগ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষ পাড়ায় সফিকুল ইসলাম, ফটিক সেখ, খোকা সেখদের এখন ঠিকানা স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল। সেখানে নেই কোনও সরকারি সাহায্য। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুল ও মাঠ ফাঁকা করে দিতে হবে। উভয়সংকটে সেখানকার সবহারা মানুষজন। ভাঙনদুর্গতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে শুখা মরশুমে পাড় বাঁধানোর কাজ করা, পাড় বাঁধাইয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ২ ডিসেম্বর পণ্ডিতপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে আবুল কালাম আজাদ সহ স্থানীয় বহু মানুষ ভাঙন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। আন্দোলন তীব্র করার লক্ষ্যে লিয়াকত আলিকে সভাপতি এবং সামসুল আলমকে সম্পাদক করে লালগোলা ব্লক পদ্মাভাঙন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে।

আদবানি আবার রথের সওয়ারি!

দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনের দাবিতে বিজেপি নেতা এল কে আদবানি সম্প্রতি রথযাত্রা শেষ করলেন। খরচের খামতি ছিল না। ৩৮ দিনের এই যাত্রায় দেশের ৪৬টি জায়গায় ঘুরেছেন আদবানি। ১৪টি বিশেষ আকাশযান এবং ৬টি হেলিকপ্টার যেকোনও সময়ে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি ছিল বলে জানা গেছে। স্লোগান যাই হোক, ওদের আসল উদ্দেশ্য যে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসা এ বিষয়ে জনমনে কোনও সন্দেহ নেই।

আদবানি তথা বিজেপি-আর এস এস-এর রথযাত্রা এই প্রথম নয়। ৯০-এর দশক থেকে ধরলে আজ পর্যন্ত তারা অন্তত ছ'বার রথযাত্রা করেছে। ’৯০ সালে ‘রামরথযাত্রা’, ’৯৩-এ ‘জনাদেশযাত্রা’, ’৯৭-এ স্বর্ণজয়ন্তী রথযাত্রা’, ২০০৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘ভারত উদয় যাত্রা’, ২০০৬-এ ‘ভারত সুরক্ষা যাত্রা’ এবং এ বছরে ‘জনচেতনা যাত্রা’।

অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের দাবি নিয়ে আর এস এস-বিজেপি প্রথম ১৯৯০ সালে রামরথযাত্রা করে। বস্তুত এই বাবরি মসজিদ ইস্যুটি বিজেপি-আর এস এসের হাতে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস। ভোটে ফায়দা তোলা নিশ্চিত করতে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককব্জা করার লক্ষ্যে বিতর্কিত বাবরি মসজিদে ১৯৮৬ সালে রামমন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দিয়েছিলেন কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি-আর এস এস যখন দেখল উগ্র ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলতে তাদের প্রিয় ইস্যুটি কংগ্রেস কেড়ে নিতে চলেছে, তখন তারা বিষয়টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আদবানির নেতৃত্বে রামরথ সেই সময় যে রাজ্যগুলির ওপর দিয়ে গেছে, সেখানেই সৃষ্টি করেছে উগ্র হিন্দু ধর্মোন্মাদনা, বিভেদের বিষবাষ্প, সাম্প্রদায়িক হানাহানি। আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এ সবের পিছনে বিজেপি-আর এস এসের ছক ছিল একটাই — কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল এবং তার জন্য হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক কবজা করা। পুঁজিপতিশ্রেণীর আশীর্বাদ ছিল তাদের সঙ্গে। কারণ, পুঁজিপতিদের স্বার্থের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষক কংগ্রেস ক্রমাগত জনসমর্থন খেয়াতে থাকায় দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে আরও একটি বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দলের প্রবল প্রয়োজন ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর।

রথযাত্রার নামে রায়ট যাত্রা পরিণতি পেল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর, ভারতের ইতিহাসে ‘কালা দিবস’ হিসাবে চিহ্নিত দিনটিতে। পরিকল্পিতভাবে হাজারে হাজারে করসেবককে প্রস্তাবিত রাম মন্দিরে প্রার্থনা করার নাম করে জড়ো করা হয়। ৬ ডিসেম্বর আচমকা তারা গাঁইতি, কোদাল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবরি মসজিদের উপর। গোটা দেশের মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেদিন দেখেছিল, কীভাবে ধর্মোন্মাদ করসেবকরা ১৬ শতাব্দীতে তৈরি হওয়া এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধটিকে গুঁড়িয়ে দিল এবং কীভাবে আদবানি সহ বিজেপির সামনের সারির নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্লোগানে করসেবকদের উৎসাহিত করলেন। বস্তুত ঐ দিনের বীভৎস ধ্বংসকাণ্ডে গোটা বিজেপি দল এবং কল্যাণ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও অযোধ্যা শহর ও মসজিদের চারিদিকে সশস্ত্র আধাসামরিক ও সামরিক বাহিনিকে পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে রেখে বাধাহীনভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙতে দিয়েছিল। অথচ চাইলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অতি সহজেই এই বর্বরতাকে রুখে দিতে পারত।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ড গোটা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের মধ্যে বিপুল মানসিক ব্যবধান তৈরি করল। ফেনিয়ে ওঠা উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দাপটে গুটিয়ে গেল অন্য অংশের মানুষ। ধর্মের নামে বিজেপি-আর এস এসের ধর্মবিরোধী এই তাণ্ডব তাদের ছক মতোই হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক সংহত করল এবং বিজেপিকে ১৯৯৬-এ কয়েক মাসের জন্য ও পরে ১৯৯৮-এ টানা পাঁচ বছর এন ডি এ জোটের প্রধান দল হিসাবে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার সুযোগ এনে দিল।

বিজেপির এই উত্থানের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন আদবানি। আর এস এসের চূড়ান্ত অনুগত এই মানুষটিকে ১৯৯৮-এর এন ডি এ সরকারের আমলে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্ব পেয়ে আদবানি দেখিয়ে দিয়েছেন আর এস এস-বিজেপি-র উগ্র মৌলবাদী রাজনীতির রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা কতখানি। সরকারের ‘সুশাসন’-এর প্রকৃত অর্থ বাস্তবে কী, তার নমুনাও খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছেন তিনি। ২০০২ সালে আর এস এস-এর অপর প্রিয়পাত্র এবং আদবানির মানসপুত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য প্রশ্রয়ে, এমনকী বলা যায়, তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গুজরাটে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ দাঙ্গা, সংঘটিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের অন্যতম কুখ্যাত গণহত্যার ঘটনাটি। যাঁরা এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয় না থাকলে ‘মুসলিমদের শিক্ষা দিতে’ এই গণহত্যা কী করে মাসের পর মাস ধরে চলতে পারল? কী করেই বা অপরাধীরা গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও কোনও গ্রেপ্তারি বা শাস্তির পরোয়া না করে সর্বসমক্ষে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার সাহস দেখালো?

২০০৪ সালে কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতা থেকে বিজেপি অপসারিত হয়েছে, কিন্তু জনগণের দুর্দশার লাঘব হয়নি। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার পুঁজিবাদের তীব্র সংকট থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীকে রক্ষা করতে সংকটের সম্পূর্ণ বোঝা নতুন উদ্যমে মেহনতি মানুষের উপর চাপাতে নীতি প্রণয়ন করেছে এবং জনজীবনকে সমস্যায় জর্জরিত করে তুলেছে। বেকারি, ছাঁটাই শ্রমিকদের অধিকার হরণ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের বিপুল ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি সংকট জনসাধারণের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সর্বোপরি নানাবিধ আর্থিক দুর্নীতি ও অন্যান্য কেলেঙ্কারি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে। এই সরকার একদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে অর্থের অভাবের অজুহাত তুলে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশি ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল পরিমাণ কালো টাকা উদ্ধারে কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি এবং কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠছে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের ক্ষমতা থেকে হঠে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ইতিমধ্যেই বাতাসে ভাসছে।

স্বাভাবিকভাবেই জনগণের কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বিজেপি নিজেকে সম্ভাব্য বিকল্প শক্তি হিসাবে খাড়া করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু জনমনে এখনও পর্যন্ত বিজেপি তার স্থান পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। শুধু এই নয়, সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পদে কাকে প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরা হবে, তা নিয়েও দলের মধ্যে ব্যাপক খেয়োখেয়ির কথা সামনে এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে বিজেপির অনেক নেতাই প্রধানমন্ত্রী হতে উদগ্রীব। দলের প্রবীণ নেতা হিসাবে আদবানির নাম সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, তাঁর এক সময়ের অতি ঘনিষ্ঠ নরেন্দ্র মোদিও প্রধামন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে উঠেছেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই আদবানি তাঁর ষষ্ঠ রথযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং জনগণের মনোভাব আঁচ করে কংগ্রেসের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সফর শুরু করেন।

স্লোগান পাল্টে দেওয়ার এই কাজে অবশ্য বিজেপির দক্ষতা সুবিদিত। একসময় ‘রামমন্দির নির্মাণ’-এর স্লোগান তুলে সরকারি ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। পরে তার ধার কমে যাওয়ায় তারা দেশের উন্নয়নের স্লোগান তোলে। কিন্তু কী ধরনের উন্নয়ন বিজেপি করতে চায় তা ইতিমধ্যেই জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবারের রথযাত্রায় বিজেপি আবার স্লোগান পাল্টে কংগ্রেসের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে গলা চড়িয়েছে। কিন্তু এ কথা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, স্লোগান যাই হোক, প্রতিটি রথযাত্রার পিছনে কাজ করেছে একটাই উদ্দেশ্য — গদি দখল করা। এবারের রথযাত্রার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি সংবাদমাধ্যমের কাছে জোর গলায় বারবার বলেছেন, এর পিছনে ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার সামান্য ইচ্ছাও আদবানির নেই। কিন্তু বাস্তব সত্য যে ঠিক এর বিপরীত, তা আদবানির বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী হতে চান কি না, সংবাদ মাধ্যমের এ প্রশ্নের উত্তরে আমতা আমতা করে আদবানি এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা থেকে তাঁর মনোগত বাসনা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেছেন, ‘আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে’, ‘আমি মানসিকভাবেও যথেষ্ট শক্তিশালী’, ‘পার্টি যদি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রার্থী করতে চায়, তাহলে আমি না বলি কী করে’, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আদবানির ইঙ্গিত একেবারেই স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে নিজের স্থান সামনের দিকে রাখতে এই প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী দলের ভিতরে ও বাইরে নিজের মলিন ভাবমূর্তি ঘষেমেজে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা শুরু করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য হল, কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ও তাদের দুর্নীতিবিরোধী মানসিকতার সুযোগ নিয়ে জনগণের কাছে নেতা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরা। সেই কারণেই তাঁর এই সাম্প্রতিক রথযাত্রার ইস্যু ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা জাগানোর ভড়ং।

আদবানি বলেছেন, তিনি দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার অভিযানে নেতৃত্ব দিতে চান। কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নে খোদ বিজেপির হাল কেমন? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের মন্ত্রী এবং বিজেপির তৎকালীন সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণকে কি ক্রিমিনাল কেসে অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগ করতে হয়নি? এন ডি এ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকেও তহেলকা ডটকম নেটওয়ার্কটি ক্যামেরাবন্দি করেছিল। ২০০২-এ অভিযোগ উঠেছিল, কারগিল যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের জন্য কফিন কেনা নিয়ে বিপুল অর্থের কারচুপি করেছে বিজেপি নেতারা। শুধু এন ডি এ আমলেই নয়, এখনও আদবানির মতো বিজেপির সেইসব নেতারাই কি জমি ও খনি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদ্দিউরাপ্পাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন না? আদবানির রথ কর্ণাটকে পৌঁছলে সাংবাদিকরা তাঁকে ইয়েদ্দিউরাপ্পার কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে তিনি কোনও উত্তর দেননি। পরে মন্তব্য করেছেন, দুর্নীতির ছোঁয়াচ থেকে কোনও রাজনৈতিক দলেরই নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। এর উপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো এ খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপি রাজ্য সরকারের পূর্তমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন যাতে কাগজে রথযাত্রার খবরটি ছাপা হয়। আদবনি কিছুই জানেন না বলে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। এ হেন বিজেপি রথযাত্রা করে ‘দুর্নীতিমুক্ত ভারত’ গড়বে — এ কথা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য। নাকি সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতা ও গদির লোভ?

আদবানি তাঁর রথযাত্রায় কংগ্রেসের অপশাসনের বদলে ‘সুশাসন’ আনার কথা বলেছেন। তাঁরা কি মনে করেন, কেন্দ্রে তাঁদের শাসনকালে বিজেপি ‘সুশাসন’-এর যে নমুনা দেখিয়েছিল কিংবা এখনও গুজরাট ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যে ক্ষমতায় বসে যে উদাহরণ তারা সৃষ্টি করছে, তা জনসাধারণের চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কংগ্রেসের মতোই বিজেপিও বুর্জোয়া দল হিসাবে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবায় সর্বশক্তি দিয়ে নিয়োজিত, দেশ-বিদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে তারাও বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-বেসরকারিকরণের নীতি রূপায়ণ করছে এবং কংগ্রেসের মতোই জনগণের দুঃখ দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলছে। বিজেপির কাছে ‘সুশাসন’-এর অর্থ হল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ সুরক্ষায় সর্বান্তঃকরণে তাদের সেবা করে যাওয়া এবং এ কাজে যারাই বিরোধিতা করবে, তাদের কণ্ঠ রোধ করা। এর সাথে বিজেপির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে রয়েছে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে গুজরাট গণহত্যার মতো সাম্প্রদায়িক বর্বরতার নজির সৃষ্টি করা এবং এ কাজে এমনকী বিজেপি শাসনাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা পাওয়া। গণহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের আড়াল করা ছাড়াও বিজেপি নেতারা সেইসময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘সুশাসন’-এর প্রশংসা পর্যন্ত করেছিলেন। সুতরাং বিজেপির এই ‘সুশাসন’ হিন্দু মৌলবাদকে শক্তিশালী করা ও সুযোগ সুবিধা মতো মাঝে মাঝেই উস্কে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু যে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

রথযাত্রা চলাকালে আদবানি এবার বিদেশের ব্যাংকে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন, যাতে ঐ টাকায় সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ, জল ও রাস্তার ব্যবস্থা করা যায়। পাটনার এক সভায় তিনি বলেন, কালো টাকার বিষয়টি নিয়ে এর আগে কেউ মাথা ঘামায়নি। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি নিজে যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল, এমনকী যখন তারা বিরোধী আসনেও ছিল, তখন আদবানি নিজে কালো টাকার বিরুদ্ধে কোনওদিন মুখ খোলেননি কেন। আসলে, এও হল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আদবানির এক কৌশলী স্লোগান।

বাস্তব ঘটনা হল, এত ব্যাপক প্রচার দেওয়া সত্ত্বেও আদবানির সাম্প্রতিক এই রথযাত্রা দলের ভিতরে বা বাইরে, কোথাওই কাঙ্ক্ষিত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেমন প্রথমে নিজের রাজ্য থেকে রথযাত্রা শুরু করার অনুমতি দেননি, তেমনই কর্ণাটকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদ্দিউরাপ্পার সমর্থকরা বেঙ্গালুরুতে আদবানির সভা বয়কট করে রথযাত্রার ব্যর্থতা দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ সবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, জনগণের মধ্যে এই রথযাত্রার সামান্য সাড়াও জাগাতে না পারার ঘটনাটি। আসলে সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে ঢাকা বিজেপি-আর এস এসের প্রকৃত চেহারা তাদের কাছে ইতিমধ্যেই বেআব্রু হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা কিংবা গুজরাট গণহত্যার মতো বর্বরতার নজির সৃষ্টিকারী বিজেপি-আর এস এস-কে চিনে নিয়েছে তারা। মানুষ দেখেছে, দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রবল ধিক্কারের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিষয়ে আদালতে নালিশ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরে স্পষ্টতই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর ইঙ্গিতে আদবানি ও তাঁর সহযোগীরা শুধু অব্যাহতি পেলেন তাই নয়, মসনদে বসার পথেও তাঁদের কোনও বাধা রইল না।

একথাও বোঝার সময় এসেছে যে, দুর্নীতি আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমার্থক। দুর্নীতি রোখার নামে এবারের রথযাত্রা ১৯৯০-এর রাম রথযাত্রার মতোই তার ঘোষিত স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। সমস্ত রথযাত্রাগুলিই সংসদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সংগঠিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যেই ১৯৯০ সালে বিজেপি ‘রাম মন্দির নির্মাণ’-এর এবং ২০১১ সালে ‘দুর্নীতিবিরোধিতা’র স্লোগান তুলেছে। এদেশের চলতি বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি যারা শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে, তারা সকলেই ক্ষমতার ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে মাঝে মাঝেই রথযাত্রার মতো বহুবিধ ভণ্ডামি ও অপকৌশলের আশ্রয় নেয় — সাধারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় এ কথা ইতিমধ্যেই বুঝেছেন। কংগ্রেস সংসদে যখন বিরোধী আসনে ছিল, তখন সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে বিপুল কুম্ভীরাশ্রু ঝরিয়েছে। সরকারে আসীন হয়ে বিজেপি তখন তার ‘মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি’র তোয়াক্কাও না করে ক্ষমতায় থাকার সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করেছে। আবার এখন ক্ষমতায় বসে কংগ্রেস যখন দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, বিজেপি তখন জনদরদী সাজছে। তার এই রথযাত্রা আসলে সংসদে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা একটি বুর্জোয়া দলের দ্বিচারিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের মুনাফার বলি

একের পাতার পর

জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছেন, কেউ কেউ ঢুকেছেন পাঁচিল ভেঙে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। টর্চের আলো ফেলে, মোবাইলের আলো জ্বেলে তাঁরা চেষ্টা করেছেন ভেতরে ঢুকতে। ঘন ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে, ভেতরে কোথায় কী কিছুই জানা নেই। হাতের কাছে যাঁদের পেয়েছেন তাঁদেরই বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। গোটা বিল্ডিংয়ে কোথাও কোনও জানালা নেই, বারান্দা নেই, জরুরিকালীন নির্গমনের ব্যবস্থা নেই। যেন এক জতুগৃহ। বস্তির মানুষই বাঁশ নিয়ে এসে ভারা বেঁধে উপরে উঠে জানালার কাঁচ ভেঙেছেন। একের পর এক তলায় ছুটে গেছেন, বের করে নিয়ে এসেছেন মুমূর্ষু মানুষদের। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ট্রলি দিয়ে রোগীদের দ্রুত নামানোর জন্য কোনও তলাতেই কোনও ঢালের ব্যবস্থা নেই। এই বিপদের সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেখা মেলেনি। আগুন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার পরই তাঁরা দ্রুত হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান ও মানবিকতা থাকলে কি এমন আচরণ সম্ভব!

স্থানীয় যুবক দীপপ্রকাশ কয়াল, সমর মণ্ডল ও তাঁদের সঙ্গীরা বললেন, আমরা বারবার দমকলে ফোন করেছি। কিন্তু দমকল আসেনি। দমকল ঢুকেছে প্রায় ভোর পাঁচটার সময়। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাঁদেরও ছন্নছাড়া অবস্থা। নামমাত্র কয়েকটা মাস্ক ছিল তাঁদের কাছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল না। তাই উদ্ধার শুরু হওয়ার পর তাঁদেরও অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের সাথে কাঁচ কাটার, সাটার কাটার যন্ত্র ছিল না। যে সিঁড়িগুলি (ল্যাডার) তাঁরা নিয়ে এসেছেন তা দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত ছোট। বারবার অনুরোধেরও এক ঘণ্টা পরে বড় মই আসে। কিন্তু প্রশিক্ষিত লোকের অভাবে দ্রুত সেগুলো চালু করা যায়নি। এমন বিপজ্জনক মুহূর্তে যে যুদ্ধকালীন তৎপরতা থাকা উচিত ছিল, তা কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন কারওরই ছিল না। মাস্কধারী কর্মীরা এসেছেন বেলা ৯টা নাগাদ।

বেলা যত বেড়েছে ততই বেড়েছে মৃতদেহের সংখ্যা। শুধু মহানগরীর মানুষ নয়, সারা রাজ্য, সারা দেশ কাটিয়েছে অধীর উদ্বেগে — এই সংখ্যা আরও কত বাড়বে! মৃতদেহের যেন শেষ নেই। একের পর এক মৃতদেহ নামিয়ে আনছেন উদ্ধারকারী স্থানীয় যুবক ও দমকল কর্মীরা। তখনও তাঁদের কারও নাকে নল লাগানো, কারও হাতে-পায়ে প্লাস্টার, কারও হাতে স্যালাইনের সূচ ঢোকানো। এঁরা এসেছিলেন বাঁচতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় ও উদগ্র মুনাফা লালসায় তাঁদেরই হতে হল লাশ। এই বেদনাময় দৃশ্য উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ চারিদিকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁরা সকলেই যেন আত্মীয় বিয়োগের গভীরতম ব্যথার অংশীদার। তাঁদের এই তীব্র শোকের সাথে মিশে ছিল স্বাস্থ্যব্যবসায়ী ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তাঁরা তখনই মুনাফা হাঙর আমরি মালিকের শাস্তি চাইছিলেন— কঠোরতম শাস্তি। 'এই নরঘাতক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ফাঁসি চাই' — বারবার বলছিলেন শোকাহত মানুষজন। সারাদিন ট্রামে বাসে ট্রেনে মানুষ এই খুনিদের বিরুদ্ধে তাঁদের গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এই অপমৃত্যু, এই শোক, এই হাহাকার তো অনিবার্য ছিল না। মালিকের মুনাফার লালসা মেটাতেই এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল।

ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতাল কোনও প্রত্যন্ত জায়গায় নয়, শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আগুন লাগার পরেও যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিত, তবে আরও বহু মানুষকে সেদিন বাঁচানো সম্ভব হত। 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' বিষয়টি এই হাসপাতালে কেবল কথার কথাই থেকে গেছে। মহানগরীতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে, আর তারপরই কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়, নতুন নতুন নীতি ঘোষণা করা হয়, নতুন নতুন কমিটিও তৈরি হয়। এগুলির পিছনে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। মন্ত্রীরা হুঙ্কার দিয়ে বলতে থাকেন, কাউকেই ছাড়া হবে না। তার পর আবার দুর্ঘটনা ঘটে। জীবন দিয়ে মানুষ তার মূল্য চোকায়। আবারও একই নাটকের পুনরাবৃত্তি চলে। বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় না। না হলে আমরি হাসপাতাল বছরের পর বছর এমন বেআইনিভাবে চলছিল কী করে? অগ্নিনির্বাপক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফায়ার-অ্যালার্ম, স্মোক-অ্যালার্ম, আগুন বা গরম ধোঁয়া প্রতিরোধী ব্যবস্থা, আগুন বা ধোঁয়া মাপার 'স্মোক ডিটেক্টর', জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর স্বয়ংক্রিয় 'স্প্রিংলার' — সব কিছুই ছিল অকেজো। বেসমেন্টে, যেখানে গাড়ি পার্কিং করার কথা, সেখানে বিপুল পরিমাণ দাহ্য তেল এবং বর্জ্য বোঝাই হয়ে ছিল, যা থেকেই দুর্ঘটনা এমন ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে পারল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখানে শুধুই মুনাফা লুটেছে, রোগীদের সুরক্ষার কথা এতটুকুও ভাবেনি। তাদের উৎকট মুনাফা লালসাই হাসপাতালকে এমন জতুগৃহে পরিণত করেছিল। সরকারি তরফে এ সবের কখনও কোনও তদারক হলেও নিয়ম ভাঙার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দু'মাস আগেই এখানকার অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থার ত্রুটি দেখে তাদের শংসাপত্র বাতিল করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড অফ হেলথকেয়ার। তা সত্ত্বেও হাসপাতাল এতদিন চলল কী করে? বিগত সরকারের সময়ে শাসক দলের সাথে ঘনিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে এবং ঘুষ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন তারা অনায়াসেই বের করে এনেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে তৈরি এই হাসপাতালটিতে 'পাবলিক' বা সরকারি বলে বোধহয় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যা ছিল তা সবই প্রাইভেট। মুনাফা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের ছিল না। 'গলাকাটা হাসপাতাল' হিসাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। অগ্রিম টাকা না দিলে চিকিৎসা বন্ধ থাকত, জরুরি অপারেশন আটকে থাকত বলে সাধারণ মানুষ বারবার এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। অথচ এখানেই রোগীদের শুষে নিয়ে তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে, শহরে একের পর এক বহুতল বানিয়ে হাসপাতাল নাম দিয়ে লুঠের কারখানা তৈরি করেছে। আজ এ কথা ভাবার সময় এসেছে যে, চিকিৎসার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধনকুবের গোষ্ঠীর মুনাফার সামগ্রী করে তুলতে দেওয়া চলে কি না। শুধু তো আমরি হাসপাতাল নয়, এই ধরনের প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল সম্বন্ধেই সাধারণ মানুষের একই অভিযোগ রয়েছে যে, সেগুলিতে যত না চিকিৎসা হয়, তার থেকে বেশি চলে লুঠ। উচ্চবিত্ত এবং ধনীরা ছাড়া কেউ চিকিৎসা করাতে পারেন না। যদি কেউ রোগী ভর্তি করতে বাধ্য হন, তবে তাঁকে শেষপর্যন্ত নিঃস্ব হতে হয়। চিকিৎসা পরিষেবার নামে এই ভয়ঙ্কর লুঠের ব্যবসার বিরুদ্ধে আজ সর্বস্তরের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। দাবি তুলতে হবে, চিকিৎসাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা চলবে না, চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।

আমরির মালিক টোডিদের উত্থানের নেপথ্যে

হাসপাতালের নামে মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছিল আমরি (অ্যাডভান্সড মেডিকেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট)। ... যে টোডি গোষ্ঠী এই হাসপাতালের অন্যতম মালিক বলে পরিচিত, তারা ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহলে 'সিপিএমের লোক' বলেই চিহ্নিত। সিপিএমের মদতেই তাদের এই হাসপাতাল কারবারের উত্থান। ....আর পাঁচজন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির মতো স্রেফ ক্ষমতাসীন দলকে নানা সময়ে 'নৈবেদ্য' চড়ানোর সূত্রে নয়, টোডি পরিবারের অন্যতম কর্ণধার শ্রবণ টোডি রীতিমতো সিপিএমের সদস্যও বটে। ...সিপিএমের প্রয়াত নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ পার্টির শীর্ষ নেতাদের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন শ্রবণ টোডি। মূলত জ্যোতিবাবুর উদ্যোগেই তিনি পার্টির সদস্য হন।...

বীরভূমের দুবরাজপুর এলাকার বনেদি পরিবারের ছেলে গুণেন রায় ডাক্তার হওয়ার পর যক্ষ্মারোগীদের জন্য ... কলকাতায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সহায়তায় সি আই টি-র জমিতে তিল তিল করে তৈরি করেছিলেন নিরাময় ক্লিনিক। মূলত সাধারণ মানুষের দান ও সরকারি অনুদানকে সম্বল করে গড়ে উঠেছিল এই প্রতিষ্ঠান।...

সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটিতে ক্রমশই ধুঁকতে শুরু করে ক্লিনিকটি। ক্লিনিকটির জনপ্রিয়তার চাপে রাজ্য সরকার (বামফ্রন্ট) সেটি অধিগ্রহণ করে। যদিও নিরাময় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে 'নিরাময়' সরকারি পলিক্লিনিকে রূপান্তরিত হয়। অথচ সরকার এই উদ্যোগকে কখনওই সফল করতে তোলার চেষ্টা করেনি।... কোণঠাসা হয়ে পড়েন গুনেন রায়। ধুঁকতে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিনাপয়সায় তুলে দেওয়া হয় জ্যোতিবাবুর স্নেহধন্য শ্রবণ টোডির হাতে।"

জ্যোতিবাবুকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়ে ১৬১ বেডের আধুনিক হাসপাতালটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯৬ সালে চালু করে দেন টোডিরা। তখন অবশ্য তাঁর এই স্বাস্থ্য কারবারে সহযোগী ছিলেন শহরের অপর এক ব্যবসায়ী তথা তৃণমূলের বর্তমান এক সংসদ সদস্য। পরে অবশ্য তিনি এই কারবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তবে টোডিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও যথেষ্ট মধুর। (বর্তমান ১০ ও ১১ ডিসেম্বর ২০১১)

* * *

১৯৯৪ সালের ১৭ জুন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমরি কর্তৃপক্ষের চুক্তি হয়। ৩০ বছরের লিজ হয়েছিল। সেই সময়ে ১ কোটি ৫ হাজার ২৫ টাকায় যে চুক্তি হয়, তার মধ্যে ৭৮ লক্ষ টাকা ইকুয়িটি শেয়ার হিসাবে রাখা হয়েছিল রাজ্য সরকারের জন্য। গোড়ায় রাজ্য সরকারের বড় অংশীদারী থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রায় পুরো মালিকানাই বেসরকারি হাতে চলে যায়। ....পরবর্তীকালে সল্টলেক এবং মুকুন্দপুরে হাসপাতাল-সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। বাড়তে থাকে বিধি ভাঙার অভিযোগও।...

আমরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি অনুযায়ী, সরকারি তরফে কোনও রোগী ভর্তি হলে তাঁর চিকিৎসার খরচে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যেতে পারে। ...ওই চুক্তি অনুযায়ী বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে নিখরচায় চিকিৎসা করানোর জন্য কিছু 'কোটা' রাখার কথা। অভিযোগ সেইসব 'শর্ত' অনায়াসে উপেক্ষিত হয়েছে আলিমুদ্দিনের স্নেহচ্ছায়ায়। বহু মানুষের প্রাণের মূল্যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে সব প্রশ্নই এখন নতুন করে উঠছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১-১২-২০১১, টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১১-১২-২০১১)

রাজ্য কমিটির শোক

একের পাতার পর

হাসপাতাল সংলগ্ন যে বস্তি উচ্ছেদের ঘৃণ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই বস্তির মানুষই প্রথম নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কর্তৃপক্ষের বাধা না মেনে জোর করে হাসপাতালে ঢুকে আক্রান্তদের উদ্ধার ও বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন এবং প্রশাসন ও দমকলকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে খবর দিয়েছেন। এ জন্য অবশ্যই তাঁরা রাজ্যবাসীর অভিনন্দনযোগ্য।

এমতাবস্থায় সরকারের কাছে আমাদের দাবি —

১। মৃতদের পরিবারবর্গকে ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা ও আহতদের পবিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২। এই মর্মান্তিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে এবং দোষী সমস্ত সরকারি ও কর্পোরেট কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৩। পিপিপি মডেলে গড়া হাসপাতাল সহ সমস্ত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই বেদনাদায়ক ঘটনায় আমরা গভীর শোকাহত। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের স্মরণে ১০ ডিসেম্বর আমরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শহর গ্রামগঞ্জ-রাস্তার মোড়ে এবং সমস্ত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সামনে সকাল ১০টায় সমবেত হয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন ও কালো ব্যাজ পরিধানের মাধ্যমে 'শোক দিবস' পালনের জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

শোকদিবসে পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কোচবিহার

মনুষ্যত্ব বিবেক রয়েছে ওঁদেরই মধ্যে

একের পাতার পর

কড়া নিষেধে তালা খোলেনি নিরাপত্তা রক্ষীরা। বারবার বলা সত্ত্বেও কিছুতেই যখন গেট খোলানো গেল না তখন হতাশ না হয়ে অদম্য জেদে, আর্ত রোগীদের উদ্ধার করতে এইসব ছেলেরাই পিছনের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকেছে, কেউ কেউ ঢুকেছে পাঁচিল ভেঙে। পাইপ বেয়ে, বাঁশের ভারা বেয়ে কোনও রকমে উপরে উঠে হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই দিয়ে তারা কাচের জানলা ভেঙে অসহায় রোগীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যে তাদের অনেকেই দমকলকে খবর দিয়েছে। কিন্তু আটকে পড়া মানুষদের বাঁচানোর সেই অসমসাহসিক লড়াই যখন জোর কদমে চলছে তখনও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দমকলের দেখা মেলেনি। পুলিশ এসেছে অনেক পরে। যদিও এসেই তারা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে, শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আমরির সামনে জড়ো হওয়া উদ্বিগ্ন আতঙ্কিত মানুষের উপর লাঠিচার্জ শুরু করেছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা দমকলকে কিছু জানাননি। কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ— হাসপাতালের খবর দমকল বা বাইরের কাউকে জানানো যাবে না, নিজেদেরই সামলে নিতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা এবং ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসবেন, তাঁদের কাছে দামী এই হাসপাতালের ভিতরের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে যে! মুনাফালোভী স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা তা কখনও হতে দিতে পারেন! গত বছর আগুন লাগায় বস্তিবাসীদের সাহায্য নিয়ে আগুন নিভিয়েছিলেন আমরির যে নিরাপত্তা কর্মীরা, তাঁদের সকলেরই চাকরি গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মাত্র দু'মাস আগে গত ৮ অক্টোবর এই হাসপাতালেরই 'ডায়াবেটিক ক্লিনিকে' আগুন লাগায় তৎক্ষণাৎ দমকলকে খবর দেন নিরাপত্তা রক্ষী হারাধন চক্রবর্তী। কর্তৃপক্ষ কাজ থেকে বসিয়ে দিয়েছিল তাঁকেও।

দামী কাচে মোড়া আগাগোড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঝকঝকে আমরি হাসপাতালের গায়ে পঞ্চাননতলা বস্তি। সরু রাস্তার দু'পাশে সারি দেওয়া ভাঙাচোরা নড়বড়ে টালি বা টিনে ছাওয়া ঘুপচি ঘর। সংসারের যাবতীয় জিনিসে ঠাসা সেই ঘরে কোনওরকমে দিন গুজরান। জলের কলে দিনরাত লাইন। ন্যূনতম আব্রুর ব্যবস্থাহীন মানবেতর জীবনযাত্রা। দিন চলে নেহাতই কষ্টে। কেউ গাড়ি চালান, কেউ হকারি করেন, কেউ দিনমজুর, কারও বা ফুটপাথে ছোট্ট দোকান। মেয়েরা প্রায় সকলেই বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। সবদিন হয়তো পেটভরা খাবারও জোটে না সকলের। আগুনে আটকে পড়া মানুষগুলোকে বাঁচাতে ছুটে যাওয়া 'দিন আনি দিন খাই' মানুষগুলো কিন্তু সেদিন একবারের জন্যেও ভাবেননি যে, কাজে না গেলে দিনের মজুরিটুকুও বরবাদ হয়ে যাবে, সন্ধ্যেবেলায় ছেলেমেয়েদের মুখে দু-মুঠো ভাতও হয়তো তুলে দেওয়া যাবে না। মনুষ্যত্ব আজও বেঁচে আছে বস্তির এইসব ঝুপড়ি ঘরের বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে রত দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যেই। আমরিতে ভর্তি রোগীদের পরিজনরা অবাক হয়ে গেছেন এঁদের দেখে। একজন মন্তব্য করেছেন, আমরির আশপাশে পঞ্চাননতলা বস্তি না থেকে যদি শুধুই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং থাকত, তাহলে উদ্ধারের কাজে বোধহয় একজনকেও খুঁজে পাওয়া যেত না। তাঁর কথাই প্রতিধ্বনিত হল একটি টিভি চ্যানেলে। ঘটনার দিন চ্যানেলটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিল আমরির পাশের এক বহুতলের বাসিন্দা প্রাক্তন অধ্যাপকের। অধ্যাপক জানালেন, ভোরবেলা ফ্ল্যাটের গার্ড তাঁকে ফোন করে জানায় আমরিতে আগুন লেগেছে। তিনি গার্ডকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে যান। অধ্যাপক ভদ্রলোক অবশ্য টিভি চ্যানেলে পঞ্চাননতলার তরুণ যুবকদের সাহসের অনেক প্রশংসা সেদিন করেছিলেন, কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যবহারে ন্যূনতম মানবিকতার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিজের পিঠে আগুনের আঁচ এসে না লাগা পর্যন্ত মধ্যবিত্ত নির্লিপ্ততার ছবিই কি সেদিন ফুটে ওঠেনি তাঁর আচরণে? অথচ এর ঠিক বিপরীত আচরণ ছিল পঞ্চাননতলার তরুণ-তরুণীদের। যে কর্পোরেট হাসপাতাল তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কোনও দিন তাকায়নি, সেই আমরিতে আটকে পড়া মানুষগুলির আর্তনাদ তাঁদের চুপ করে বসে থাকতে দেয়নি। অথচ পঞ্চাননতলার ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ দখল করে, পুকুর বুজিয়েই তৈরি হয়েছিল আমরির অগ্নিদগ্ধ এই অ্যানেক্স বিল্ডিং। এমনকী আমরিতে কাজ করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন এখানকার যে সব বেকার ছেলেমেয়েরা, তাঁদের একজনেরও চাকরি জোটেনি। একজন সাংবাদিক লিখছেন, "যাঁরা রোগীদের বাঁচাতে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিযোগ, এখানকার লোক জেনেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিকিৎসার কোনও সুবিধা দেয়নি। বরং এমনও হয়েছে বস্তির কেউ হাসপাতালে ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য গেলে বলা হয়েছে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে।.... প্রাণের মায়া না করে সেই হাসপাতালেই উদ্ধার কাজে ঝাঁপ দিলেন কেন? দীপপ্রকাশের মতো যুবকরা বলেছেন, 'রোগীরা একে তো ঘটিবাটি বিক্রি করে চিকিৎসা করাচ্ছেন, তার ওপরে যদি প্রাণটাই চলে যায়! তাই ছুটে গিয়েছিলাম'।" হাসপাতালে ভর্তি এক রোগীর পরিজনের কথায়, 'আগে ভাবতাম কলকাতা থেকে বস্তি উঠে যাক। এখন মনে হচ্ছে বস্তি থাকুক, চলে যাক এইসব বহুতল।' আগুন লাগার দু'ঘণ্টা পরে যখন পুলিশ, দমকল এসেছে ততক্ষণে এই তরুণ-তরুণীরাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধার করে ফেলেছেন আরও অনেককে। সংবাদপত্রের ভাষায়— "পুলিশকর্মীরা হাতজোড় করে বললেন, 'আপনারা ওদের বাঁচান, আমরা সঙ্গে আছি।' কারণ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও বুঝেছিলেন, এই জতুগৃহ থেকে 'বেপরোয়া' বস্তিবাসীদের 'বেআইনি' অভিযানই একমাত্র বাঁচাতে পারে প্রাণ"। আগুন লাগার চার ঘণ্টা বাদে দমকলের ব্রন্টো ল্যাডার আসার পরেও দমকল কর্মীরা যখন দিশাহারা, তাঁদের সহায় হয়েছেন ঐ বস্তির যুবকরাই। তাঁরাই ল্যাডারে উঠে ধোঁয়ায় ভরা ওয়ার্ডগুলিতে দ্রুত ঢুকে মানুষকে উদ্ধার করেছেন। সাংবাদিকরা অবাক হয়ে দেখেছেন, জীবনের হতাশা থেকে ড্রাগের মারণ নেশার অন্ধকার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়া সমাজের চোখে ঘৃণিত একজন মানুষ কীভাবে কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে প্রায় ৮-১০ জনকে বাঁচিয়েছেন। একজন সাংবাদিক যখন তাঁর ইন্টারভিউ নিতে চেয়েছেন, তিনি লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচেন। আসলে মানুষ বিপদে পড়লে মানুষকেই যে উদ্ধারে এগিয়ে আসতে হয়, ফেলে পালিয়ে যাওয়া চলে না — এটাকেই সত্য বলে, স্বাভাবিক বলে, উচিত বলে বিশ্বাস করেন দারিদ্র্যের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, রং চটা জামাকাপড় পরা, খেটে খাওয়া এইসব সংগ্রামী মানুষ। যে অসহসাহসিকতার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন, তা যে বিশেষ কিছু, অন্যরকম কিছু, এটা তাঁরা মনে করতেই পারেন না। তাই ভাবতেও পারেন না, তাঁদের এই ভূমিকার প্রচার হবে সংবাদমাধ্যমে, মানুষ তাঁদের নিয়ে মাতামাতি করবে। এই মানবিকতার পুরস্কার হিসাবে একটি টিভি চ্যানেল বস্তির দশজনকে চাকরি দিতে চাইলে যুবকরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন — 'সবাই মিলে কাজ করেছি। আলাদা করে আমরা দশ জন সুযোগ নেব কেন?' আরও বলেছেন, 'মানুষকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। মানুষ হিসেবে তার জন্য কোনও কিছুই আশা করি না'। যখন সাংবাদিকরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন, সকলকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আপনারা খুশি?' পঞ্চাননতলার গোটা পাড়ার হয়ে তখন গণেশ মণ্ডল, তারকরা বলেছেন, 'দাদা মানবিকতার খাতিরে কাজ করেছি, সরকার পুরস্কার দিক না-দিক, যায় আসে না'।

উদ্ধার করতে গিয়ে যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের বা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও নেই কোনও অনুশোচনা। বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইডের ধোঁয়ায় অসুস্থ ২৩ বছরের কলেজ ছাত্র শঙ্কর মাইতিকে পর দিন একটি হাসপাতালের আই সি সি ইউতে ভর্তি করতে হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তড়িৎ পুরকায়েত। টিনের বা টালির চাল দেওয়া খুপরি ঘরে বিষ ধোঁয়ার জেরে কাতরাচ্ছেন পঞ্চাননতলার অনেক উদ্ধারকারী। বমি করছেন, আহত হয়েছেন অনেকে। এঁদের চিকিৎসার খরচ কীভাবে চলবে, কেউ জানে না। অসুস্থদের জন্য প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা হয়নি। 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'-এর পরিচালনায় চলা দুটি ক্যাম্প ছাড়া আর কেউ তাদের ওষুধের ব্যবস্থাও করেনি।

মুনাফালোভী স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত অর্থলোভের বলি হয়ে এখনও পর্যন্ত ৯৩ জন অসহায় মানুষের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়েছে পৃথিবী থেকে। এঁদের মৃত্যুতে পরিজনদের নিরুপায় ক্ষোভ, অপার শোক সময়ের সাথে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। থেমে যাবে আমরির 'গণহত্যা' নিয়ে যাবতীয় হৈ চৈ। মানুষও ভুলে যাবে বস্তির এঁদো গলির কলের সামনে জলের লাইনে দাঁড়ানো বা গড়িয়াহাট মোড়ে পুলিশের তাড়া খাওয়া পঞ্চাননতলার হকার ভাইদের মুখগুলো, যে মুখগুলো ৯ ডিসেম্বর রাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মনুষ্যত্বের বিভায়, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচানোর অদম্য প্রেরণায়। মানুষ ভুলে যাবে বেঁচে থাকার জন্য আট-দশ বাড়ি কাজ করে সংসারের চাকা ঠেলে নিয়ে চলা বস্তিবাসী পরিচারিকা মায়েদের ফ্যাকাশে মুখগুলো, যতদিন না আমরি অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনও অভিশপ্ত ঘটনা আবার ঘটে এবং আবারও এ কথা তুলে ধরে যে, মনুষ্যত্ব বিবেক আজও রয়েছে মলিন, ছেঁড়া জামায় ঢাকা এই মানুষগুলি বুকের মধ্যেই। এই সমাজ এদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে। শুধু কেড়ে নিতে পারেনি নির্মম এই পৃথিবীর বুকে লড়াই করে বেঁচে থাকার অদম্য প্রাণশক্তিটুকু। অথচ সমগ্র সমাজ জুড়ে মনুষ্যত্ব বোধের চরম আকাল, শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়ার চিন্তা। অন্য মানুষ দূরে থাক, এমনকী পরিবারের মধ্যেও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে মমতার সেই বন্ধন। জমে উঠেছে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতার ক্লেদ। তাই আবার আমরির মতো কোনও ঘটনা ঘটলে বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা চলে যাবেন যে যার মতো নিজের কাজে। আর জীবন বাজি রেখে মানুষের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বস্তির এইসব তথাকথিত 'ছোটলোক'রাই।

অসুস্থ স্থানীয় উদ্ধারকারীদের চিকিৎসায় মেডিকেল ক্যাম্প

অগ্নিদগ্ধ আমরি হাসপাতালে আটকে পড়া রোগীদের উদ্ধারে প্রাণ হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যাঁরা, সেই স্থানীয় পঞ্চাননতলার তরুণ যুবকরা অনেকেই বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য ঘটনার পরদিন ১০ ডিসেম্বর ঐ এলাকায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাসের নেতৃত্বে পাঁচজন ডাক্তার সহ মোট ১০ জনের একটি টিম এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষের চিকিৎসা করেন। এঁদের মূলত যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি হল মাথাযন্ত্রণা, দুর্বলতা, বমি ভাব, চোখজ্বালা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। এ ছাড়া কাটা-ছেঁড়া, হাতে-পায়ে আঘাত ইত্যাদি চিকিৎসার জন্যও অনেকে এসেছেন। বেশ কিছু শিশু বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রভাবে শ্বাসকষ্ট, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে।

হাসপাতালের বেসমেন্টে আগুন লাগার খবর পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতায় এলাকাবাসীকে উদ্ধার কাজে বাধা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যারা বহু মানুষের প্রাণ বাঁচালো তাদের চিকিৎসার বিষয়ে সরকার কিন্তু উদাসীন।

১১ ডিসেম্বরও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল-এর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে আরও একটি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প উদ্বোধন করেন হার্ট ক্লিনিকের সেক্রেটারি ডাঃ কিষাণ প্রধান। চিকিৎসার সাথে সাথে ওষুধও দেওয়া হয়।

শোকপালন

একের পাতার পর

সামন্ত, এ আই ডি এস ও সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড গোপাল সাহু, এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড উমা পণ্ডা, দলের ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড আশীষ মিত্র, যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে শ্যামল গুহমজুমদার, মুরলীধর গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদের সম্পাদিকা ইরানি গিরি, নেতাজি কালচারাল ফোরামের পক্ষে বৈদ্যনাথ হালদার, গড়িয়াহাট ইন্দিরা হকার্স ইউনিয়নের পক্ষে রঞ্জন দাস, পরিচারিকা সমিতির পক্ষে তনুশ্রী শাসমল সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। উপস্থিত সাংবাদিকরাও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পথচলতি ও স্থানীয় মানুষ সহ দুই শতাধিক মানুষ নীরবতা পালনে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যের সর্বত্র গ্রামে শহরে স্টেশনে হাসপাতালে শোক পালিত হয়। কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বেদি স্থাপন করে শোক পালিত হয়। এছাড়া বর্ধমান, কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা শহর সহ বিভিন্ন স্থানে শোকবেদি স্থাপন করে দলের কর্মী-সমর্থকদের সাথে সাধারণ মানুষ শোক পালন করেন।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের উদ্যোগে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলি, জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত রাজ্যের শতাধিক স্থানে শোকদিবস পলিত হয়। কোথাও হাসপাতালের ভেতরে, কোথাও গেটে এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে ক্লাসে ক্লাসে চিকিৎসক, ছাত্র, নার্স এবং রোগীরা একত্রে ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। বেশ কয়েকটি হাসপাতালের সুপার, ডেপুটি সুপাররাও শোকপালন অনুষ্ঠানে সামিল হন। এছাড়া সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার মানুষজন এবং গড়িয়াহাট মার্কেটের হকার, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষ মোমবাতি নিয়ে মিছিল করেন এবং নীরবতা পালন করেন।

ঢাকায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আর একটি মাইলফলক

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সকল রাস্তা ২৭ নভেম্বর যেন একমুখী হয়ে উঠেছিল। মহানগর নাট্যমঞ্চ সংলগ্ন ময়দানের দিকে মানুষের ঢল। ওখানেই ঐ দিন সকাল ১১টায় ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সভা। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল এবার যৌথভাবে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (তৃতীয় সম্মেলনে পরিবর্তিত নাম হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এই দুয়ের উদ্যোগে আহূত হয়েছিল সম্মেলন। অবশ্যই ঢাকায় এই

কমরেড মানিক মুখার্জী

সম্মেলনের যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছিল বাসদ, যা তারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থলের দিকে তখন মানুষ চলেছে দলে দলে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনের বার্তা ঘোষণা করে, জেলার পর জেলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকরা মিছিল নিয়ে ঢুকছে ময়দানে। তাদের চোখে-মুখে চলনে-বলনে গভীর আবেগ ও উদ্দীপনা। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিরা একে একে এলেন। কিশোর ভলান্টিয়াররা তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মঞ্চে তখন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ একে একে ঘোষণা করছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের নাম। বিশাল মঞ্চে একে একে গিয়ে তাঁরা বসলেন। মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন আন্তর্জাতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। মঞ্চের সামনের আসনগুলিতে তখন বসেছেন ওই দেশের বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ। ঢাকার চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিবেশন করল তাদের অনুষ্ঠান। বেজে ওঠে নজরুল ইসলামের রণসঙ্গীতের সুর। শেষ হতেই মঞ্চে দণ্ডায়মান প্রতিনিধিরা বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বিকাল ৩টায় প্রতিনিধিদের সামনে রেখে শুরু হয় বিশাল মিছিল নিয়ে শহর পরিক্রমা। জনসমাগম তখন ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। প্রথমেই এই সম্মেলনের আয়োজনের জন্য বাসদ-এর নেতা-কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেন, একদিকে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন, অন্যদিকে পুঁজিবাদী তীব্র আর্থিক সংকট ও তাকে ঘিরে দেশে দেশে গণবিক্ষোভ — এই পটভূমিতেই এবারের সম্মেলন এবং বিগত প্রথম কলকাতা ও দ্বিতীয় বেইরুট সম্মেলনে যত দেশ থেকে প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, এবার তৃতীয় সম্মেলনে তার চেয়ে বেশি প্রতিনিধি এসেছেন নানা দেশ থেকে। কেউ কেউ আসতে পারেননি 'ভিসা' সমস্যার জন্য। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ও সেগুলিকে সমন্বিত করে আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার যে আহ্বান নিয়ে আমরা ১৯৯৫ সালে কলকাতা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেই চিন্তা ও প্রয়াস ছিল যথার্থ।

তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির উল্লসিত হয়েছিল, পাশাপাশি সাম্যবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বহু মানুষ হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন, পুঁজিবাদই শেষ কথা। সমাজতন্ত্রের আন্দোলন আর গড়ে তোলা যাবে না, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল করি। আমাদের শিক্ষক ও এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের পাথেয়। তাঁর এই চিন্তা ও শিক্ষার ভিত্তিতেই আমাদের দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড নীহার মুখার্জী দেখান যে, পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণেই সংকটগ্রস্ত হবে, জনজীবনে দুর্দশা ঘটাবে, মানুষ সংকট থেকে মুক্তির আশা নিয়ে আন্দোলনে আসবেই, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা আরও বেপরোয়া হবে, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিপদ বাড়বে। এই সময় দরকার বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তোলা, যার ভিতরে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে কমিউনিস্টদের।

তাকিয়ে দেখুন, আমেরিকা, ইউরোপের দিকে। সর্বত্র জনগণ রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। টিউনিশিয়ার পর মিশরের আন্দোলন, এখন খোদ আমেরিকার বুকে ২ মাসের ওপর ধরে চলছে ওয়াল স্ট্রিট বিক্ষোভ। আওয়াজ উঠেছে 'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক', 'পুঁজিবাদ আমাদের সমস্যার জন্য দায়ী'। আজ প্রয়োজন যথার্থ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার। এটা না হলে আন্দোলন সঠিক লক্ষ্যে এগোতে পারবে না।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে ইরাককে ধ্বংস করেছে, আফগানিস্তানে হত্যা চালাচ্ছে,

কমরেড রণজিৎ ধর

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গদ্দাফিকে নৃশংসভাবে হত্যা করল, এসবই দুনিয়ার মানুষ জানে। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও লুণ্ঠনকে প্রতিহত করতে আজ দেশে দেশে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গঠন করে আন্দোলনকে তীব্র করা দরকার।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষে অনেকে আমাদের প্রশ্ন করেন যে, ও দেশের সিপিএম, সিপিআই ও নানা বামপন্থী গোষ্ঠী রয়েছে, যারা নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টিও বলে, তারা কেন এই মঞ্চে নেই, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত করছি না কেন। সমস্যা হল, ভারতের এই দলগুলোর কোনওটাই ভারতরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী বলে মনে করে না। ভারত যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে চলছে, বাংলাদেশের জনগণ তা জানেন। নেপাল-শ্রীলঙ্কার জনগণ বোঝেন। ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকার ফলেই বাংলাদেশের জনগণ ইন্দিরা-মুজিব নদীজল চুক্তির দ্বারা বঞ্চিত হয়েছেন। এখন তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে আর একটি চুক্তি করতে যাচ্ছে ভারত। এই চুক্তিতে কী আছে, সরকার তা জানায়নি। এমনকী আমাদের দলের সংসদ সদস্য বলছেন, এমপি-দেরও এই চুক্তির কপি দেওয়া হয়নি। কেন এই গোপনীয়তা? বাংলাদেশের মানুষকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ নিয়েও যা চলছে তাতে বরাক নদীতে জলসরবরাহ কমে বাংলাদেশের কৃষিজীবী জনগণ সমস্যায় পড়বেন। এভাবে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের একতরফা ভারতীয় সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমরা দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছি। এসব তো পুঁজিবাদী ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকারই দৃষ্টান্ত। আমরা দাবি করেছি, দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করেই এই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ভারতের একচেটে পুঁজিপতি টাটা এসেছিল সস্তায় এখান থেকে গ্যাস কিনে মুনাফা লুটতে, আপনারা তাতে বাধা দিয়েছেন। ভারত বলছে, বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে তারা বহু শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। কেন করবে? অবশ্যই বাংলাদেশের সস্তা শ্রমশক্তিকে লুঠ করার জন্য। এগুলি কি ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের লক্ষণ নয়? যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না, তাঁরা কী করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বেন। শুধু বাইরের রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলব, নিজ রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে নীরব থাকব এই মনোভাব কখনই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে পথ দেখাতে পারে না। ভারতের সিপিএম প্রমুখ দলগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে বলেই, এই মঞ্চে আমরা তাদের ডাকতে পারিনি। কারণ, মূল যে রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠবে, সেখানে তো একমত হওয়া চাই।

পরিশেষে তিনি বলেন, এবারের সম্মেলনে আমরা সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার দুই প্রতিনিধিকে পেয়েছি, যেটা যথার্থই আনন্দের। পাকিস্তান ও মিশরের কমিউনিস্ট পার্টির

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

প্রতিনিধিরা এসেছেন। নেপাল, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, সুদান, ইরান, ফ্রান্স, লেবানন, জর্ডন, কানাডা, আমেরিকা থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছেন। এই তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের সকল প্রয়াস সার্থক হবে যখন এই সম্মেলনের বার্তা নিয়ে বাংলাদেশেও একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

সাতের পাতায় দেখুন

দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ

ছয়ের পাতার পর

আই এ সি সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির নেত্রী সারা ফ্লাউন্ডার্স বলেন, আমাদের কমিটির সভাপতি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা র‍্যামসে ক্লার্ক আসতে পারলেন না তাঁর ক্যান্সারে আক্রান্ত সন্তান হঠাৎ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায়। তিনি এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সম্মেলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন।

নেপাল থেকে নেতৃস্থানীয় তিনজনের প্রতিনিধি দল ছাড়াও ছাত্র-যুবদের একটি দল এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র আন্তর্জাতিক ব্যুরোর প্রধান এবং নেপালের পূর্বতন উপপ্রধানমন্ত্রী কমরেড কৃষ্ণ বাহাদুর মহারা বলেন, তৃতীয় সম্মেলন এবার নেপালে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে আমরা পারিনি। আমাদের দলের চেয়ারপার্সন কমরেড পুষ্পকুমার দহল 'প্রচণ্ড'-এর এই প্রকাশ্য সমাবেশে এসে বক্তব্য রাখার কথাও স্থির ছিল। কিন্তু দেশের মধ্যে হঠাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়ে পড়ায় তিনিও আসতে না পেরে একটি লিখিত বার্তা পাঠিয়েছেন। সেটি পড়ে শোনান কমরেড মহারা। ঐ বার্তায় কমরেড প্রচণ্ড বলেন, ''এই সম্মেলন নেপালে করার জন্য আমরা ইতিপূর্বে পরিকল্পনা করলেও, নানা কারণে পারিনি। আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল ঢাকায় সম্মেলনে অংশ নিয়ে আমাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমরেডদের কথা শোনার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় আমার যাত্রা বাতিল করতে হয়। আমরা নেপালে এই মুহূর্তে ইতিহাসের এক জটিল সন্ধিক্ষণে আছি, এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তনে আমরা অন্যতম প্রধান শরিক হওয়ায় এ সময় আমার উপস্থিতি অপরিহার্য। আমি আশা করব, প্রাণবন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সঠিক পথ নির্ণয়ে সফল হবেন। আমাদের দল ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) সর্বদা বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত জনগণের পাশে আছি। আসুন, আমরা সকল রকম শোষণ-নির্যাতন, সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই।'' কমরেড মহারা ছাড়াও নেপাল থেকে এসেছিলেন কমরেড নিনু চাপাগাইন।

উত্তর কোরিয়ার কমরেড কাঙ মুন রিয়ল

উত্তর কোরিয়া থেকে আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটির পক্ষে কমরেড কাঙ মুন রিয়ল লিখিত ভাষণে বলেন, ইতিহাসে এটা প্রমাণিত যে, যুদ্ধ ও চাপ দিয়ে অথবা নিষেধাজ্ঞা-অবরোধ জারি করে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। আজ মানবজাতি পুরানো আধিপত্যবাদী ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল, যা মানবজীবনে দুর্দশাকে স্থায়ী করেছে, তার ধ্বংসসাধন করে এক স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়তে চায়।

আজ সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে অপর দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত করছে, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আধিপত্য কায়েমের প্রয়াস চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির সাথে সংহতিকে আমরা আরও সুদৃঢ় করব।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষার জাতীয় কমিটির সম্পাদক প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার সাথে এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও সম্মেলনের যোগসূত্র আছে।

সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন, সভার সভাপতি, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী স্বপ্নকে কীভাবে জাতীয় বুর্জোয়ারা পদদলিত করে চলেছে, তার নানা দিক তুলে ধরেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে বাংলাদেশ সরকারের আত্মসমর্পণের নীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি সে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম গড়ে তোলার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষ হয় চট্টগ্রাম 'চারণ'-এর সঙ্গীত-অভিনয় পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

২৮ ও ২৯ নভেম্বর কাজী বশির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সকালের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন উত্তর কোরিয়ার আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটির প্রতিনিধি কমরেড রি সঙ। এই অধিবেশনেই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের খসড়া পেশ করেন আন্তর্জাতিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। বিকালের দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ।'

বিকালের প্রতিনিধি অধিবেশন দুই ভাগে দুটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। একটি মূল মঞ্চে, অপরটি শিল্পকলা ভবনে। একটির বিষয় ছিল 'সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ'। এতে সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি আলেকজান্ডার মুম্বারিস। অপরটির বিষয় ছিল 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও তার সর্বগ্রাসী প্রভাব', এতে সভাপতিত্ব করেন নেপালের কমরেড সুরেশ আলি মেগার। এই দুটি অধিবেশনেই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বহু বিশিষ্টজনও বক্তব্য রাখেন। ২৯ নভেম্বর সকালে দুই ভাগে দুটি হলে তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড খালেকুজ্জামান

বিকালে মূল মঞ্চে, সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আই এ সি সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর ও 'বাসদ' কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই সম্মেলন বাংলাদেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করল। আমরা ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চাই, কিন্তু সেজন্য মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক লাইনে ঐকমত্য চাই। সমাপ্তি অধিবেশনে পাকিস্তানের পিস কাউন্সিলের প্রতিনিধি কমরেড হাসিম বলেন, অনেকে মনে করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক মিলিটারি যখন গণহত্যা চালিয়েছে, তখন পাক জনগণ বোধহয় শাসকদের সমর্থন করেছিল, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা সে সময় পাক মিলিটারি শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করেছি।

সম্মেলনের একটি স্মরণিকা এরপর সকল প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারতের রূপশ্রী কাহালির আবেগময় আবৃত্তি সকল শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে।

পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণে কমরেড খালেকুজ্জামান এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন ও সফল করার জন্য যাঁরা যেখানে যা যা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মুনাফার কারবারই আমরির ঘটনার জন্য দায়ী
শোক মিছিলে বললেন চিকিৎসকরা

আমরির মর্মান্তিক ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ ডিসেম্বর গোটা রাজ্য জুড়ে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ অসংখ্য স্থানে শোকবেদি স্থাপন এবং কালো ব্যাজ পরিধানের কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ঐ দিন বেলা ২ টোয় গোলপার্ক থেকে আমরি হাসপাতাল পর্যন্ত এক মৌন মিছিলে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি, পিপলস হেলথ, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ সহ বিভিন্ন সংগঠন এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন পেশার প্রায় সহস্রাধিক মানুষ সামিল হন। আমরি হাসপাতালের সামনে ১ মিনিট নীরবতা পালিত হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহসভাপতি এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত ৯ ডিসেম্বর অভিশপ্ত দিনটিকে 'পি পি পি বিরোধী দিবস' হিসাবে প্রতিবছর পালন করার কথা ঘোষণা করেন। এলাকার যে যুবকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান। যাঁরা উদ্ধার করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের চিকিৎসার জন্য তিনি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে মেডিকেল ক্যাম্প করার কথা ঘোষণা করেন।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিষয়ে আপনার মতামত পাঠান এই ঠিকানায় ঃ

গণদাবী প্রিন্টার্স, ৫২ বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩,
ফ্যাক্স নং ঃ (০৩৩) ২২৬৪৫১১৪
ই মেল ঃ ganadabi@gmail.com

আন্দোলনে 'আশা' কর্মীরা

হুগলি ঃ এম পি-এম এল এ, মন্ত্রীদের প্রতি নির্ভর করে আন্দোলনে আপনাদের দাবি আদায় হবে না, ওরা আন্দোলনকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না, দাবি আদায় করতে হলে নিম্নতম স্তর থেকে কমিটি গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলুন — ৩ ডিসেম্বর চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে 'আশা' কর্মীদের এক সমাবেশে এ কথা বলেন এআইইউ টিইউসি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

সরকারি কর্মচারি হিসাবে স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট বেতন, স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা সহ দশ দফা দাবিতে আশা কর্মীদের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। নেতৃবৃন্দ সিএমওএইচ-এর কাছে দাবি সনদ পেশ করেন। সমাবেশে প্রধান বক্তা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য আরও বলেন, আপনারা এতদিন পূর্বতন সরকারের ওপর নির্ভর করেছিলেন, তারা আপনাদের বঞ্চিত করেছে। সেই সরকারের হাত থেকে বাঁচার জন্য পরিবর্তন চেয়েছেন। তাই বিগত সরকারের দুঃশাসনের রাজত্ব গেছে। নতুন সরকার এসেছে। আপনারা সারাদিন পরিশ্রম করেন, কী দেয় সরকার? দেয় ১০০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা। দেশে আইন আছে ৮ ঘন্টা কাজ, নির্দিষ্ট মজুরির। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে তা নেই। এই আন্দোলনে এ আই ইউ টি ইউ সি আছে, থাকবে। আন্দোলনের মধ্যেই আপনাদের নেতৃত্বকে চিনে নিতে হবে। এমনকী আমাদের নেতৃত্বকেও অন্ধের মতো সমর্থন করবেন না। অভিজ্ঞতা দিয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করবেন। আপনাদের এ লড়াইকে দীর্ঘস্থায়ী করুন। জোরদার করুন। আপনাদের লড়াইয়ের সাথে আই সি ডি এস কর্মী সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের যুক্ত করে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিন। সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সহসভাপতি কমরেড বঙ্কিম বেরা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা আশা কর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা পার্বতী ঘোষ ও সুমনা রায় এবং আশা কর্মী বীথিকা রায়। ৮ ডিসেম্বর হুগলি জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে মূল দাবি ছিল, প্রতিটি আশা কর্মীকে পি এফ, ই এস আই, পেনশনসহ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং রাজ্য মিশন অধিকর্তার নির্দেশ নং HEW/NRHM/20/06/389 তারিখ ২৫-০২-২০১১ বাতিল করতে হবে।

মুর্শিদাবাদ ঃ ২৭ নভেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হলে আশা কর্মীদের মুর্শিদাবাদ জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের প্রোজেক্টে, গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ যে ৬ ধরনের কাজ প্রোজেক্টের সূচনা পর্বে নির্দিষ্ট ছিল, মাসিক ৮০০ টাকা ইনসেনটিভ বরাদ্দের মাধ্যমে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ জারি করা এক নতুন সার্কুলারে আশা কর্মীদের নিজস্ব কাজ ২৬ রকম এবং জনস্বাস্থ্যের ৯ রকম মোট ৩৫ রকমের বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো হয়েছে। এই নির্দেশের ফলে আশা কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে বিভাজন এবং পূর্বের বরাদ্দ ৮০০ টাকা থেকে অনেক আশা কর্মীদের ক্ষেত্রেই ৩০০/৪০০ টাকায় নেমে এসেছে। সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলি, যথা গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস ইত্যাদি কিছুই নেই। বক্তব্য রাখেন, পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড বিমল জানা, রাজ্য সহসভাপতি বঙ্কিম বেরা, এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদক কমরেড সুখেন সেনগুপ্ত প্রমুখ।

দ্বারক ঘোষকে সভাপতি, বেবি খাতুনকে সম্পাদিকা, কেয়া খাতুনকে অফিস সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

থানা লকআপে গৃহবধূর উপর পাশবিক নির্যাতন

প্রতিবাদে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বড় সাধের 'আদর্শ থানা' মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা আবারও 'আদর্শ' ভূমিকা পালন করল। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় সিপিএম সরকারের বদলে এসেছে তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোট সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে এসেছেন মমতা ব্যানার্জী। কিন্তু হরিহরপাড়া থানা সেই একই রকম 'আদর্শ' থানাই থেকে গেল।

মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ লতিফা বিবিকে ২৯ নভেম্বর রাত ১২টায় তাঁর বাড়ি থেকে চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ভ্যানে তোলে পুলিশ। লতিফার কোনও অপরাধ ছিল না। সম্পত্তি সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদের জেরে পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে না পেয়ে তাঁকে এভাবে তুলে আনে। হরিহরপাড়া থানার ওসির নির্দেশে সেকেন্ড অফিসার সহ ছ'জন পুলিশ কর্মীর একটি

হরিহরপাড়া

দল লতিফাকে এইভাবে শুধু তুলে আনে তাই নয়, গাড়িতে তাকে প্রায় বিবস্ত্র করে তার গোপনাঙ্গে বুটসুদ্ধ লাথি মারতে থাকে। তারপর থানা লকআপে নিয়ে এসে পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। সারা রাত ধরে অত্যাচার চলে। পরদিন ৩০ নভেম্বর সারাদিন তাঁকে চিকিৎসাহীন অবস্থায় লকআপেই ফেলে রাখা হয়। অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করে পুলিশ তাঁকে রাতে হরিহরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সামান্য চিকিৎসার পর বাড়িতে রেখে আসে।

এই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে 'অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন'-এর নেতা-কর্মীরা লতিফার বাড়িতে ছুটে যান এবং ২ ডিসেম্বর স্থানীয় হরিহরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক পুলিশি সন্ত্রাসের ভয়ে আহত রোগিনীকে হাসপাতালে ভর্তি নিতে আপত্তি করেন। কিন্তু লতিফার অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখনও তিনি ওখানেই চিকিৎসাধীন। তাঁর শরীরে অন্তত ১৮টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রভাতী গোস্বামী ও রাজ্য কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট অনুরাধা মণ্ডল হাসপাতালে দেখা করলে লতিফা তাঁদের কাছে পুলিশি অত্যাচারের বিবরণ দেন। ৫ ডিসেম্বর মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলে, দোষী ছয় পুলিশ কর্মীকে কর্তৃপক্ষ সাসপেন্ডকরে এবং পরে আরও একজনকে সাসপেন্ড করা হয়। একটি বাংলা দৈনিক এই ঘটনার রিপোর্ট করতে গিয়ে ৬ ডিসেম্বর লিখেছে, 'সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ... এই বিক্ষোভ না হলে লজ্জাকর এই ঘটনা হয়তো ঢাকাই পড়ে যেত।'

৭ ডিসেম্বর তরতিপুর গ্রাম এবং ৮ ডিসেম্বর স্বরূপপুর গ্রামে সংগঠিত প্রতিবাদ সভা কার্যত জনসভায় পরিণত হয়। এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার সহ রাজ্য সম্পাদিকা হাসি হোড়, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা অনিতা মুখার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি পেশ করেন এবং নির্যাতিতা লতিফার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে এফ আই আর হিসাবে কেন দেখা হচ্ছে না এবং আইনানুগ ধারায় অভিযুক্ত ওসিকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না — তার কারণ জানতে চান। পুলিশ সুপার তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টের প্রতিলিপি প্রতিনিধি দলকে দেখান এবং জানান যে, এই রিপোর্ট তিনি ডিজিকে পাঠিয়েছেন। তা হলে ওসি-র বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না — এই প্রশ্নে পুলিশ সুপার প্রথমে নীরব থাকেন ও তারপর নিজের অক্ষমতার কথা জানান। সিপিডিআরএস-এর প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারের কাছে জানান, অপকর্মে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। প্রভাতী গোস্বামী, অ্যাডভোকেট অনুরাধা মন্ডল ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তাফা ও তরতিপুর গ্রামের সংগঠক আনিসুর রহমান।

৯ ডিসেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকেও ডেপুটি সুপারের নিকট সুচিকিৎসার দাবি তোলা হয়। নিগৃহীত মহিলা যে মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত, সে ব্যাপারে সংগঠনের তরফে সুপারের নিকট দেখভালের দাবি জানানো হয়।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার দাবি করেছেন, সম্পূর্ণ সরকারি খরচে নিগৃহীত মহিলার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই সঙ্গে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দোষী পুলিশদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে মামলা রুজু করতে হবে।

নো-সাইক্লিং জোন ঘোষণার প্রতিবাদে

সাইকেল আরোহীদের মিছিল

২০০৮-এ তৎকালীন সিপিএম সরকারের আমলে চালু হওয়া আইন আরও ব্যাপকভাবে কার্যকর করে বর্তমান সরকারের পুলিশ কলকাতা শহরের বহু এলাকাকে 'নো-সাইক্লিং জোন' বলে ঘোষণা করেছে। গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ যেখানে রুটি-রুজির সন্ধানে অর্থের অভাবে দু'বেলা দূর-দূরান্তের রাস্তা সাইকেলে পাড়ি দেন, তখন 'নো-সাইক্লিং জোন'-এর এই ঘোষণা যে তাঁদের দুর্দশা আরও বাড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই কালা আইন প্রত্যাহার এবং সাইকেল আরোহীদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে সাইকেল আরোহীরা পথে নেমেছেন। নিজেদের রুটি-রুজি রক্ষা করতে, বেঁচে থাকার স্বার্থে গড়ে তুলেছেন আন্দোলনের হাতিয়ার 'কলকাতা সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা কমিটি'। নো-সাইক্লিং জোন বাতিলের দাবিতে মাসাধিক কাল ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর কমিটির নেতৃত্বে বালিগঞ্জ ২বি বাস স্ট্যান্ড থেকে তিন শতাধিক আরোহীর সাইকেল মিছিল শুরু হয়। শুরুতেই পুলিশ বাধা দিয়ে বলে, মিছিল করা যাবে না। পরে আন্দোলনকারীদের দৃঢ় মনোভাব দেখে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি দেয়। আরোহীরা মিছিল করে গড়িয়াহাট পৌঁছে প্রতীকী পথ অবরোধ করে। শিবাজী দে-র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ডি সি ট্রাফিকের কাছে হাজার হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র জমা দেয়। তিনি বলেন, আপনাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু জায়গায় লেন করা এবং আরোহীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কমিটি প্রচার, গ্রুপ মিটিং করে কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পঞ্চাননতলার সাহসী যুবকদের অভিনন্দন জানালো এ আই ডি ওয়াই ও

আমরি হাসপাতালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্র দুর্গত এলাকায় যান এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য নেতৃবৃন্দ। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ ও যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের অভিনন্দন জানান। ঐ এলাকার যুবক শঙ্কর মাইতি যিনি উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাঁর সঙ্গে সংগঠনের কলকাতা জেলার নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে ছাড় দিয়ে

২৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান

এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

১১টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের আহ্বানে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে সর্বভারতীয় ধর্মঘট হতে চলেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন আজ হাহাকারে ভরা। চুক্তিতে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে, যাদের ভবিষ্যতের কোনও নিরাপত্তা নেই। এদিকে চলছে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি। আমরা কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের রিলিফ চাই। তাদের পেনশন ও ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কিত নিরাপত্তা চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ না করে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে, ন্যূনতম মজুরি আইন সংশোধন করে ন্যূনতম মজুরি মাসে দশ হাজার টাকা করতে হবে, সমস্ত শ্রমিকের পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে, আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে, বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঊর্ধ্বসীমা বাতিল করতে হবে এবং গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বাড়াতে হবে। এই দাবিতেই ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট।

২৮ ফেব্রুয়ারি এ রাজ্যে মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। তা হলে ধর্মঘটের দিন পরিবর্তন করা হচ্ছে না কেন? জবাবে তিনি বলেন, ধর্মঘট কেবল এ রাজ্যের বিষয় নয়। এটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের অঙ্গ। তাই ধর্মঘটের তারিখ এখন আর পরিবর্তন করা যায় না। তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম, পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ এই দাবিগুলির প্রতি মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষার দিনটি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, পরীক্ষার দিন না পিছানোর বিষয়ে বর্তমান সরকার অনড়। গণআন্দোলনের প্রতি পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতোই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে বর্তমান রাজ্য সরকার। অথচ ১১ লক্ষ পরীক্ষার্থী তো আমাদের পরিবারেরই সন্তান। এই পরিস্থিতিতে আমরা পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ আশংকার কথা বিবেচনা করে ২৮ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট থেকে পশ্চিমবাংলার পরিবহন ব্যবস্থাকে ছাড় দেওয়ার কথা বলছি এবং বিষয়টি বিবেচনার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

'তা হলে ধর্মঘট হাফ-হার্টেড হয়ে যাবে না তো?' — সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমরেড সাহা বলেন, রাজ্যে পরিবহনকে ছাড় দিলে ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে যায় না। আমরা ইতিপূর্বে এ রাজ্যে ধর্মঘট করেছি। দেখেছি, সরকার জোর করে বাস-ট্রাম চালালেও আন্দোলনের সমর্থনে জনগণ তাতে ওঠেনি, বয়কট করেছে পরিবহনকে। ধর্মঘট সফল হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলি যদি শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে নিচুতলা পর্যন্ত ধর্মঘটের বার্তা নিয়ে যেতে পারে, তবে ধর্মঘট ১০০ শতাংশ সফল হবে। তিনি বলেন, এই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব কেন্দ্রীয় সরকার ও মনোপলি হাউসগুলোর উপর পড়বে।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু-র সঙ্গে মিলে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন করছে এ আই ইউ টি ইউ সি। কিন্তু এ রাজ্যে একসঙ্গে করছে না কেন? ৮ নভেম্বর সব শ্রমিক সংগঠন মিলে যখন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে বিক্ষোভ সমাবেশ করল, তখন এ আই ইউ টি ইউ সি তাতে ছিল না।' জবাবে কমরেড সাহা বলেন, ৮ নভেম্বর আমরা রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ছিলাম না, কিন্তু আমরা এ রাজ্যে ওই দিনই আলাদাভাবে জেল ভরো আন্দোলন করেছি। কেন এ রাজ্যে একসঙ্গে নয়, তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ের ঘা এখনও শুকোয়নি। রাজ্যবাসীর কাছে সিপিএম ও তাদের শ্রমিক সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই তাদের সঙ্গে এ রাজ্যে একসঙ্গে আন্দোলন করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যে একই দাবি নিয়ে ওরা প্রচার করছে, আমরাও প্রচার করছি, কিন্তু আলাদাভাবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী ও কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।